প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার ধারণা, পরিধি ও কাজ

(Concept, Scope and Function of Education)

১। ভূমিকা (Introduction):

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এমন কতকগুলি শব্দ আছে এককথায় যার অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। 'শিক্ষা' এমনই একটি শব্দ, অল্প কথায় সহজে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ করা রীতিমত দুরূহ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিকরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এর অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ্ সক্রেটিস *(Socrates)* থেকে শুরু করে ডিউই *(Dewey)* পর্যন্ত এবং প্রাচ্যদেশে যাজ্ঞবল্ক্য *(Yajnavalkya)* থেকে শুরু করে মহাত্মাগান্ধী পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। ফলস্বরূপ শিক্ষার বিভিন্ন ধারণা ও সংজ্ঞার উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'শিক্ষা' হ'ল একটুকরো হীরের মত যাকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন রং বলে মনে হয়। অনেকেই এ-প্রসঙ্গে অন্ধমানুষদের হস্তীদর্শন এর উদাহরণটিরও উল্লেখ করেন। অন্ধ মানুষদের মত একজন জীববিজ্ঞানী, একজন পুরোহিত, একজন মনোবিদ্, একজন দার্শনিক, একজন শিক্ষক, একজন ব্যবসায়ী ইত্যাদি প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা পোষণ করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাদের এই ধারণা তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন এবং সীমিত জ্ঞানভিত্তিক অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

শিক্ষা সম্পর্কে এই ধরনের বিভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। **প্রথমতঃ,** শিক্ষার বিষয়বস্তু মূলতঃ ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে কেন্দ্র করেই রচিত। অথচ ব্যক্তিসত্তা হ'ল ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলির একটি জটিল সংগঠন। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ফলেই শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষা মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সাহায্য করে। এই পরিবেশেরও বিভিন্ন দিক আছে। যেমন সামাজিক পরিবেশ, ভৌত পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি। অন্যদিকে আবার দেশ, কাল ভেদেও পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য সংলক্ষিত হয়। চিন্তাবিদ্গণও পরিবেশের এক একটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রাচীনকালে মানুষের জীবনধারা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর তত গুরুত্ব আরোপ করা হত না। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ঐ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। **তৃতীয়তঃ,** বিভিন্ন ধরনের জীবনদর্শনের উপস্থিতির কারণে শিক্ষার বিভিন্ন ধারণার উদ্ভব

হয়েছে। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রভাবও শিক্ষার বিভিন্ন ধারণার পিছনে কাজ করে।

সুতরাং প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ্, পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ যে শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন তাৎপর্য এবং সংজ্ঞাপ্রদানের চেষ্টা করেছেন তার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও মূলতঃ পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার রূপান্তর ঘটেছে।

২। 'শিক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etimological Meaning of the term Education)

ব্যুৎপত্তিগত বিচারে 'শিক্ষা' শব্দটি মূলতঃ সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে উদ্ভূত। শাস্ ধাতু দ্বারা শাসন, নির্দেশ, আজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, তিরস্কার, শাস্তিদান ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। গতানুগতিক (Traditional) শিক্ষায় শাস্তিদান ছিল শিক্ষাদানের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। শৃঙ্খলা রক্ষা, সংযত জীবন যাপন, সর্বপ্রকারের আনন্দ উপভোগ বর্জন—এক কথায়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠোরতা ছিল প্রাচীন শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয়। উক্ত কঠোরতার মধ্যে 'শাস্' ধাতুর অর্থ সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা বিশ্বাস করতেন, বহিরঙ্গের বা পঞ্চইন্দ্রিয়ের কঠোর সংযম শিক্ষার্থীকে উচ্চমার্গের জ্ঞানচর্চার এবং তার আভ্যন্তরীণ শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশে সাহায্য করে।

অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যে 'শিক্ষা' ছিল সূত্র সাহিত্যের[১] একটি নাম। এই বিশেষ অংশে ছিল উচ্চারণ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা। বেদবিদ্যা শিক্ষার জন্য উচ্চারণের বিধি মেনে চলতে হত। সূত্র-সাহিত্যের একটি নাম হলেও শিক্ষা শব্দটির ব্যবহার ছিল অনেক বেশী ব্যাপক। যেমন, সংস্কৃতে 'বিদ্যা' শব্দটি শিক্ষার একটি অনন্য উপাদান। মূল 'বিদ্' ধাতু থেকে 'বিদ্যা' শব্দের উদ্ভব। 'বিদ্' এর অর্থ বিশেষভাবে জানা (to Know) বা জ্ঞান (Knowledge) অর্জন করা। তাহলে সহজেই বলা যায় শিক্ষা হল জ্ঞানার্জনের প্রয়াস।

বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা নানা অর্থ প্রকাশ পায়। 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জন বা কোনকিছু আয়ত্ত করাকে বোঝায়। আবার এর দ্বারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বা কোন বিধি নির্দেশ পালনের কথাও বোঝায়। উপরন্তু অন্যায় বা অবাঞ্ছনীয় কাজের জন্য শাস্তিদানের কথাও এই 'শিক্ষা' শব্দটি দ্বারা প্রকাশ পায়। যেমন, চোর বা ডাকাতকে উচিত শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ শাস্তিদান করা বোঝায়। তাহলে লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

১। সূত্র সাহিত্য—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প।

এখন আমরা 'শিক্ষা' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে ইংরেজি অভিধানের স্মরণাপন্ন হতে পারি।

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Education শব্দটি ব্যবহৃত হয়। Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। ল্যাটিন ভাষায় তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—Educatum, Educare এবং Educere। প্রথমটি অর্থাৎ Educatum শব্দটির অর্থ শিক্ষণ কর্ম (Act of teaching) বা শিক্ষকতা। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ Educare শব্দটির অর্থ হল লালন পালন করা (To bring up), প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষণ দেওয়া বা রূপদান করা (To train, to mould)। তৃতীয়টি অর্থাৎ Educere শব্দটির মর্মার্থ হ'ল প্রকাশ করা, প্রতিপালন করা (to lead out), বিকাশ ঘটানো (to draw out)। আলোচ্য তিনটি ল্যাটিন শব্দের ভাবগত অর্থ Education শব্দটির দ্বারা নিঃসন্দেহে অভিব্যক্ত হয়। তবে প্রথম দুটি অর্থাৎ Educatum এবং Educare শব্দদ্বয়ের অর্থ শেষোক্ত Educere শব্দের অর্থ অপেক্ষা সংকীর্ণ। কিন্তু তিনটি শব্দের সম্পর্ক অতি নিবিড়—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত তিনটি শব্দের তাৎপর্যগত নিবিড়তা একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমটি অর্থাৎ Educatum মূলতঃ শিক্ষকতার নীতি ও পদ্ধতির অর্থ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ Educare শব্দটিতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শিশুকে তৈরি করার ভাবার্থ সুস্পষ্ট। তৃতীয়টির বুৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। অর্থাৎ ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়নকে শিক্ষা বলা হয়। শেষোক্ত কথাটি অনেক দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[1] শিক্ষায় শিশুর অনন্ত সম্ভাবনা ও সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন কাম্য হলেও যে সম্ভাবনা, শক্তি ও প্রবৃত্তি সমাজ-অভিপ্রেত নয় তা সর্বদা বর্জনীয়। তাই অনেকেই শিক্ষার্থীর সম্ভাবনা ও শক্তি নির্বাচন করার পক্ষপাতী।[2] অথচ শিক্ষার্থী জানে না যে তার সম্ভাবনা ও শক্তির কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ। তাই এ-ব্যাপারে শিক্ষককেই শিক্ষার্থীর শক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। উপনিষদের নচিকেতার গল্প থেকে জানা যায়, সমকালীন শিক্ষায় গুরু-শিষ্যের কথোপকথন এমনভাবে পরিচালিত হত যেন শিষ্যের আধ্যাত্মিকতা ও বাঞ্ছনীয় শক্তি এবং সম্ভাবনার বিকাশসাধন সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষায় যাতে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে তার অনুকূল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বজনকাম্য। তাই Education

---

1. "Education is the manifestation of the perfection already in man. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings it out?" —Swami Vivekananda

2. By education I mean an all round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit. —Mahatma Gandhi

বা 'শিক্ষা' শব্দটির অর্থগত তাৎপর্যের পূর্ণতার জন্য Educere শব্দটির সঙ্গে Educatum এবং Educare শব্দদ্বয়ের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। শিশুর সুপ্ত বাঞ্ছনীয় সম্ভাবনার বিকাশের জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩। শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাদর্শ (Various concepts of Education):

(ক) শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতীয় মতাদর্শ (Indian concept of Education): শিক্ষা একটি সামাজিক ক্রিয়া। এর প্রকৃতি ও ধারণা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহু ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিক আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। তাই ভারতীয় মনীষীদের মতাদর্শকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(i) আর্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋক্‌বেদে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া যায়। শিক্ষা সম্পর্কে ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্মত্যাগ ব্রতে ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করে।[1]

(ii) উপনিষদে বলা হয়েছে, যে শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যার মূল বক্তব্য হল মানুষের মুক্তি।[2]

(iii) বিখ্যাত ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির মতে মানুষের শিক্ষা হল সেই শিক্ষণ যা সে প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়ে থাকে।[3]

(iv) দার্শনিক কণ্বাদ বলেন—'শিক্ষা হল আত্ম-পরিতৃপ্তির বিকাশ'।[4]

(v) বিখ্যাত ভারতীয় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শিক্ষা হল তাই যা মানুষকে সচ্চরিত্রবান ও পৃথিবীর নিকট উপযোগী করে তোলে।[5]

(vi) অর্থশাস্ত্র রচয়িতা বিখ্যাত রাজনীতিবিদ চাণক্য বা কৌটিল্যের মতানুসারে শিক্ষা হল দেশসেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ও জাতির প্রতি ভালবাসা।[6]

(vii) বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্যের মতে শিক্ষা হল আত্মোপলব্ধির (self realisation) উপায়মাত্র।

---

1. Education is something which makes a man self-reliant and self-less. —Rige-Veda
2. Education is that whose end product is salvation.—The Upanishads
3. Human-education means the training which one gets from Nature. —Panini
4. Education means development of self contentment.—Kannad.
5. Education is that which makes a man of good character and useful to the world.—*Yajnavalka*
6. Education means training for the country and love for the Nation. —*Kautilya*

আধুনিককালের ভারতীয় মনীষীদের শিক্ষা চিন্তার সঙ্গে পরবর্তীকালে আমাদের ব্যাপক পরিচয় ঘটবে। তবু তাঁদের কয়েকজনের শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটিকে আমরা এই সুযোগে তুলে ধরছি:

(i) আধুনিকযুগের মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী ও বেদান্তবিদ্ বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাগুলির প্রকাশ।[1]

(ii) রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল তাই যা কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।[2]

(iii) শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকে মনে করেন সেই প্রক্রিয়া যা বিকাশোন্মুখ আত্মাকে তার অন্তর্নিহিত সত্তার স্ফুরণে সাহায্য করে।[3]

(iv) মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতে শিক্ষা হল, শিশু ও বয়স্ক মানুষের দেহ, মন ও আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির পূর্ণতার বিকাশ।[4]

(v) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে ডঃ রাধাকৃষ্ণন শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে শিক্ষা কেবল জীবিকা অর্জনের পন্থা মাত্র নয়, এমন কি চিন্তা ও ভাবের সূতিকাগৃহ বা নাগরিকত্ব অর্জনের প্রতিষ্ঠানও নয়। এ হল ভাবজীবনে প্রবর্তনা, সত্যানুসন্ধান ও ধর্মাচরণে দীক্ষা লাভ। এটি হল দ্বিতীয় জন্মবিশেষ।[5]

(খ) শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মতাদর্শ (Western concept of Education):

(i) দার্শনিক প্লেটোর (*Plato*) মতে শিক্ষা হল সেই শক্তি যারা দ্বারা সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনাভূতি বোধ জন্মায়। এটি শিক্ষার্থীর দেহে ও মনে সকল সুন্দরকে এবং তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে বিকশিত করে।[6]

---

1. Education is the manifestation of the perfection already in man. —*Vivekananda*

2. The highest education is that which does not merely gives us information but makes our life in harmony with all existence.—*Rabindranath*

3. "...helping the growing soul to draw out that is itself.—*Aurobinda*

4. By education, I mean an all round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit.—*Gandhiji.*

5. Education according to Indian tradition is not merely a means to earning a living; nor it is only a nursery of thought or a school for citizenship. It is initiation into the life of spirit, a training of human souls in the persuit of truth and the practice of virtue, It is a second birth, 'dvitiyams janman'. —*Radhakrishnan*

6. Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of.

—*Plato*

(ii) অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) বলেন, সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক শক্তি, বিশেষ করে তা মনকে এমনভাবে বিকশিত করে যাতে সে বিস্ময়কর ও শাশ্বত সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনায় সমর্থ হয়।[1]

(iii) কমেনিয়াসের (*Comenius*) দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা হল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। এর সাহায্যেই মানুষ নিজেকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।

(iv) দার্শনিক লকের (*Locke*)-এর মতে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল জীবনশক্তির সত্যকার ছাঁচনির্মাণ।[2]

(v) মন্টেগু (*Montague*) বলেন, আপন শক্তি সমূহের যথার্থ অনুশীলন ও বিকাশ হল শিক্ষা।[3]

(vi) রুশোর (*Rousseau*) মতে শিক্ষা হল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ।[4]

(vii) পেস্তালৎসির (*Pestalozzi*) মতে শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ।[5]

(viii) হার্বার্ট বলেন, শিক্ষা হল সুন্দর নৈতিক চরিত্রের বিকাশ।[6]

(ix) ফ্রয়েবেল বলেন, শিক্ষা হল অন্তরস্থিত সুপ্ত সম্ভাবনার উন্মেষণ।[7]

(x) হার্বার্ট স্পেন্সারের দৃষ্টিতে শিক্ষা হল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি।[8]

(xi) থমসন বলেন, ব্যক্তির আচার-ব্যবহারের অভ্যাস, চিন্তাধারা ও প্রতিবিন্যাসের স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে তার উপর পরিবেশের যে প্রভাব তাই-ই শিক্ষা।[9]

(xii) স্যার জন অ্যাডামস *(Sir Jone Adams)* -এর মতে শিক্ষা হল একটি সচেতন ও ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া যার সাহায্যে এক ব্যক্তিত্ব অপর একটি ব্যাক্তিত্বের উপর প্রতিক্রিয়া

---

1. Education is the creation of a sound mind in a sound body...it develops man's faculty, espsecially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty in which perfect happiness essentialliy consists. —*Aristotle.*
2. Education in its widest meaning is the moulding of life.—*Locke*
3. Education is a development and exercise of the faculties.—*Montaigue*
4. Education is the childs development from within.—*Rousseau*
5. Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers—*Pestalozzi.*
6. Education is the development of good moral character.—*J.F. Herbert*
7. Education is the unfoldment of what is already unfolded in the term. —*Froebel*
8. Education is the preparation for complete living in future.—*H. Spencer*
9. Education is influence of the environment on the individual with a view to producing a permanent change in his habits of behaviour of thought and attitude.—*G. H. Tomson.*

করে। এর উদ্দেশ্য হল জ্ঞান পরিবহণ এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে অপর ব্যক্তিত্বটির বিকাশ-ধর্ম নির্ধারণ করা।[1]

(xiii) স্যার পার্সিনান (*P. Nunn*)-এর মতে শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের এমন পরিপূর্ণ বিকাশ যাতে তার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ ক্ষমতানুযায়ী সে মানুষের জীবনে মৌলিক কোন অবদান রেখে যেতে পারে।[2]

(xiv) শিক্ষাবিদ ডিউই-র (*Dewey*) মতে শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপন প্রক্রিয়া। এটি মানুষের শক্তি সমূহের এমন একটি বিকাশ যা তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত এবং সম্ভাবনাগুলিকে সংশোধন করতে পারে।[3]

শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, অ্যারিস্টটল, পেস্তালাৎসী, প্লেটো প্রমুখ শিক্ষাবিদদের দেওয়া শিক্ষার সংজ্ঞায় শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোক্ত শিক্ষাবিদদের সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, জন্মসূত্রে শিশু যথেষ্ট সম্ভাবনার অধিকারী। শিক্ষার কাজ হবে ঐ সমস্ত সম্ভাবনাগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটানো। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং প্রকৃতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে জন ডিউই, থমসন প্রমুখ শিক্ষাবিদদের শিক্ষাসংক্রান্ত সংজ্ঞায় সামাজিক এবং পরিবেশগত দিকের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে মানুষ হ'ল সামাজিক জীব। জন্মসূত্রেই শিশু সমাজের সদস্য। সমাজের সদস্য হিসাবে সমাজে তার সুনির্দিষ্ট মর্যাদা আছে। সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তি সারাজীবন সমাজে যেমন নানা অধিকার ভোগ করে তেমনি সমাজে তার অবশ্যপালনীয় কিছু কর্তব্যও থাকে। ভবিষ্যতে শিশু যাতে তার মর্যাদার প্রতি যথাযথ সুবিচার করতে পারে তার জন্য তাকে তৈরী হতে হবে। শিক্ষা শিশুর মধ্যে সেই সমস্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবে যেগুলির সহায়তায় শিশু তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারবে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর বলা যেতে পারে যে, গান্ধীজীর দেওয়া সংজ্ঞাটিকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে। গান্ধীজী বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন।

---

1. Education is a conscious and deliberate process in which one personality acts upon another in order to modify the development of that order by the communication and manipulation of knowledge.—*Adams*

2. Education is the complete development of the individuality of the child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity.—*T.P. Nunn*

3. Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities.—*Dewey*

তিনি বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষার্থীর দৈহিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের প্রয়োজনে তার হৃদয় (heart) এবং আত্মার (spirit) প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা বলতে তিনি শিক্ষার্থীর দেহ (body), মন (mind) এবং আত্মার সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীর পূর্ণতর বিকাশকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সাক্ষরতাই শিক্ষার শুরু বা শিক্ষার লক্ষ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষরতা হ'ল নারী ও পুরুষকে শিক্ষিত করে তোলার উপায়। গান্ধীজী তাঁর সংজ্ঞায় 'অন্তর্মুখী প্রবহন' (pouring in) অপেক্ষা 'নিষ্কাশন করা' (drawing out)-র উপর অধিকগুরুত্ব আরোপ করেছেন। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে প্রকৃতি শিশুদের অফুরন্ত জীবনীশক্তির অধিকারী করেছে। শিক্ষার কাজ হল ঐ জন্মগত জীবনীশক্তি অবদমিত না করে তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। শিক্ষার্থীর 'সর্বাঙ্গীন' (all round) বিকাশ বলতে তিনি শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ বা দেহের বিকাশ অথবা আত্মা বা হৃদয়ের বিকাশকে বোঝাননি। তাঁর মতে একজন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরী করতে হলে শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক, মানসিক, আত্মিক ইত্যাদি সমস্ত দিকের যথাযথ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। 'প্রকৃত শিক্ষা' (True Education) বলতে তিনি সেই শিক্ষাকেই বুঝিয়েছেন যা শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক সম্ভাবনাগুলির প্রকাশ ঘটায় এবং ঐ শক্তিগুলিকে উদ্দিপিত করে।

'সর্বোৎকৃষ্ট' (best in man) বলতে তিনি ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক ক্ষেত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলির কথাই বলেছেন। এদের কোন একটি দিককে অবহেলা না করে শিক্ষা ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটাতে সচেষ্ট হবে।

কিন্তু কিভাবে ব্যক্তির ঐ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে নিষ্কাশিত করতে হবে? এ সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি শিক্ষক হলে প্রথমেই শিক্ষার্থীর হৃদয়স্পর্শ করতে সচেষ্ট হতেন, তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চাইতেন। তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতেন এবং সর্বোপরি তার সম্ভাবনাগুলির বিকাশে যথাযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা শিক্ষা কি তা জানতে পারলাম। এখন আমাদের মনে স্বভাবতঃই শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দেয়। বিচারের কষ্টিপাথরে শিক্ষাচিন্তার বিষয়গুলি যাচাই করলে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে। সেগুলি হল—

(১) এটি একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং এই প্রক্রিয়াটি হল ঐচ্ছিক ও সচেতন।
(২) এই প্রক্রিয়াটি আবেষ্টনীর মধ্যে সংঘটিত হয়।
(৩) বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হলেও শিক্ষা মূলতঃ শিশুর বিকাশ ধর্মের উপর গুরুত্ব দেয়।
(৪) শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে।

(৫) শিক্ষা ব্যক্তির সম্ভাবনাগুলিকে যথাযথ স্ফুরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

(৬) শিক্ষা ব্যক্তিকে জীবনপথে চলার উপযুক্ত হাতিয়ার দিয়ে দেয়। এমন কি তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল কর্তব্য সম্পাদনে উপযুক্ত করে তোলে।

(৭) এটি ব্যক্তির সমগ্র জীবনব্যাপী একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।

বাংলায় 'শিক্ষা' এবং ইংরাজীতে Education শব্দদ্বয়ের অর্থ (Meaning) সন্ধান করতে গিয়ে এবং শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে দুটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির (View point) সন্ধান পাওয়া গেল, যথা—ব্যাপক অর্থে শিক্ষা (Education in the Broad Sense) এবং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা (Education in the Narrow Sense)। এক্ষণে আমরা এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রস্তাব করছি:

৪। শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ ও ব্যাপক অর্থ (Narrow meaning and wider meaning of Education):

(ক) শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ (Narrow meaning of Education): আদিমকালে মানুষ জীবনসংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্য আহরণ করত বা যে সব কৌশল আয়ত্ত করত তাকেই বলা হত শিক্ষা। কিভাবে শিকার করতে হয়, কিভাবে মাঠে চাষ করতে হয়, কিভাবে সামাজিক ও নৈসর্গিক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়—এসব অভিজ্ঞতা তারা বয়স্কদের কাছে থেকে শিখত। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ফলে এই অভিজ্ঞতা ও কৌশল অর্জনের উপায় পরিবর্তিত হয়। শিক্ষাদানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষায়তন যেখানে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে আমাদের চিরপরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বোঝায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ সচেতনভাবে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ ও দক্ষতা বংশপরম্পরায় সরবরাহ করে। দার্শনিক শিক্ষাবিদ্ *G.S.Mill*-ও শিক্ষাকে এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ তার সঞ্চিত সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত করে। সংস্কৃতির এই ধরনের সঞ্চালনের উদ্দেশ্য হ'ল সংস্কৃতির ধারাকে বজায় রাখা এবং সম্ভব হলে এই ভাণ্ডারটির উন্নয়ন ঘটানো। এদিক দিয়ে দেখলে শিক্ষা হ'ল বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বাঞ্ছিত, সমাজনির্ধারিত দিকে শিক্ষার্থীদের আচরণধারা পরিবর্তনের সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত সচেতন প্রক্রিয়া। কিছু বিশেষ ধরনের এবং সুনির্দিষ্ট প্রভাব এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত। সমাজের প্রাপ্তবয়স্করা শিশু ও শিক্ষার্থীদের উপর সচেতনভাবে এই প্রভাব বিস্তার করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি *(Mackenzie)* বলেন, "সংকীর্ণ অর্থে একে মনে করা যেতে পারে আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত ও অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে পরিচালিত যে-কোন প্রচেষ্টা।" কাজেই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা শিক্ষালয়ের মত কোন পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

পরিচালিত হয়; এক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর উপর সুচিন্তিত, সচেতন এবং সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করা হয়ে থাকে; এই অর্থে শিক্ষা হল, ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু পূর্ব নির্ধারিত বিষয় শেখানো; এক্ষেত্রে জ্ঞানই হ'ল সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে অনেকে প্রক্রিয়া (process) এবং উৎপাদন (product) হিসেবেও বিবেচনা করেন। যেমন—প্রথমটির কথা মনে রেখে বলা হয়, শিক্ষা হ'ল আমাদের জ্ঞান, কৌশল বা দক্ষতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, বাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া (process)। এক্ষেত্রে পূর্ব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে কিভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আবার উদ্দেশ্যপূরণ কতটুকু হলো অথবা কি কি উদ্দেশ্য সার্থক হল তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে বলা হয়—শিক্ষা হল উৎপাদন (product) বা ফলশ্রুতি। অর্থাৎ শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সৃষ্টিকরার সামগ্রিক ফলাফল। শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেই সংকীর্ণ অর্থে অনেকে শিক্ষা বলতে জ্ঞানার্জনকেই বোঝান। অর্থাৎ শিক্ষা হল কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন তথা তথ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া। এই ধারণা অনুযায়ী জন্মের সময় শিশুমন হল শূণ্য কলসীর মত। শিক্ষা নামক প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিক্ষকের জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান এই শূণ্য কলসীর দিকে প্রবাহিত হয় এবং এই ভাবে একসময় শিশুমন জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বা Education কে Instruction-ও বলা হয়ে থাকে। কোন বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কোন বিশেষ তথ্য বা তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানার্জনে অথবা কোন বিশেষ ব্যবহারিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করাকে Instruction বলা যেতে পারে। জন ডিউই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে বলেছেন ইচ্ছামূলক শিক্ষা (Intentional Education)।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার গ্রহণ যোগ্য সংজ্ঞা হল—শিশু যে সমাজে বসবাস করে তাকে সেই সমাজের উপযোগী সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র, সমাজ, বিদ্যালয় এবং পরিবার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ সচেতন ও ইচ্ছাকৃতভাবে যে প্রয়াস পরিচালনা করে তাই শিক্ষা।[1] সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রণিধানযোগ্য :

প্রথমতঃ, শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনে পারদর্শী করার চেষ্টা বলে মনে করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে অর্থাৎ লৌকিক অর্থে এবং আইনের ভাষায় আমরা যখন 'শিক্ষা' শব্দের ব্যবহার করি, তখন ব্যক্তির আত্মচর্চা বা তার উপর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন প্রভাব বুঝি না। সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা

---

1. তুলনীয়: In the narrow sense, Education refers to schooling the process by which Society, through its different institutions specially founded for the purpose, deliberately transmits its cultural heritage--its accumulated knowledge, value and skill from one generation to onother.
—The Concept of Education: Dr. C. Seshadri.

অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ শিশুদের উপর সচেতনভাবে যে প্রভাব বিস্তার করে, সংকীর্ণ বা লৌকিক অর্থে তাই হল শিক্ষা। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় বিশেষ পাঠ্যসূচী অনুসারে অধ্যয়ন ও তার অনুশীলনই হল শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ, সংকীর্ণ বা লৌকিক শিক্ষার একটি সামাজিক স্বীকৃতি আছে। পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থী কতটুকু শিক্ষালাভ করেছে তা মেপে নেবার প্রয়াস আমরা পাই। অভিজ্ঞানপত্র বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদানের দ্বারা সমাজ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেয়।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার এই পাঠ্যসূচী সমাজের অভিভাবক এবং শিক্ষা পরিচালকগণই নির্ধারিত করেন। তাঁদের বিবেচিত বিষয়গুলি অথবা বিষয়গুলিতে সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু (Content) অর্থাৎ তাঁরা শিক্ষার্থীর পক্ষে যা অনুকূল বলে মনে করেন, তাকে তাই গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব কোন চাহিদার মূল্য এই শিক্ষায় স্বীকৃত হয় না। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটানই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষক এখানে পরিবেশক মাত্র।

চতুর্থতঃ, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা উপযোগিতাভিত্তিক (Utilitarian)। প্রয়োজনের তাগিদে রুজি-রোজগারের জন্য আমরা নানারকম বৃত্তি (vocation) গ্রহণ করি; কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরী বা ব্যবসা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করি। কোন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ (specialised) হওয়াই এই অর্থে শিক্ষা। কিন্তু এর ফলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বঞ্চিত হই। চেষ্টিতবাদ (Faculty Theory) আমাদের মনকে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ করে এবং প্রতিটিকে পৃথকভাবে চর্চা করাই শ্রেয়ঃ মনে করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা এই চেষ্টিতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা দ্বারা আমরা অনুভূতি, বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিকে আলাদাভাবে চর্চা করব। কিন্তু এই লৌকিক বা সংকীর্ণ শিক্ষায় আমাদের ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপ পাই না।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক অর্থ (Wider meaning of Education): কিলপ্যাট্রিকের মতে *(William H. Kilpatrik)* ব্যাপক অর্থে সুচিন্তিত জীবনযাপনই শিক্ষা। এই অর্থে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক। শিক্ষা ও জীবন এক্ষেত্রে সমার্থক। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি সমস্তধরনের প্রভাবই এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মাটি, জলবায়ু ইত্যাদিও আমাদের শিক্ষা দেয়। ব্যাপক অর্থে যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত করে, আমাদের অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর করে, আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে পরিমার্জিত করে এবং আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে— তাই আমাদের শিক্ষা দেয়। লজ *(R. C. Lodge)* বলেন যে ব্যাপক অর্থে সমস্ত অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। মশার কামড়, লেবুজলের স্বাদ, এরোপ্লেনে ভ্রমণ, ঝড়ের সময় ছোট নৌকায় থাকা ইত্যাদির মত সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ

শিক্ষামূলক প্রভাব রয়েছে। এই অর্থে শিশু তার পিতামাতাকে শেখায়, ছাত্র তার শিক্ষককে শেখায়। তাঁর মতে ব্যাপক অর্থে শিক্ষাই জীবন এবং জীবনই শিক্ষা। কাজেই ব্যাপক অর্থে ব্যক্তির মন, চরিত্র অথবা শারীরিক সামর্থ্য প্রসঙ্গে কোন গঠনমূলক উপযোগিতা আছে এমন যে-কোন কর্ম বা অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ্ মনীষীদের অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। যেমন, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো *(Plato)* বলেন, শিক্ষা শিশুর স্বকীয় সামর্থ্য অনুসারে দেহ-মনের বিকাশ ঘটায়। সুদূর অতীতে অ্যারিস্টটল *(Aristotle)* শিক্ষার তাৎপর্য প্রসঙ্গে দেহ-মনের সুষম বিকাশ ও তার মাধ্যমে জীবনের মাধুর্য ও সত্য উপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার ব্যাপক অর্থ-প্রসঙ্গে রেমণ্ট (*Raymont*) তাঁর Principles of Education শীর্ষক পুস্তকে বলেন যে, শিক্ষা হল মানুষের শৈশব থেকে সাবালকত্বের স্তর পর্যন্ত বিকাশের প্রক্রিয়া। এরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে তার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধান করে। বস্তুতঃ, শিক্ষা মানুষকে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা প্রদান করে। ম্যাকেঞ্জি *(Mackenzie)* তাঁর 'Outline of social Philosophy' নামক পুস্তকে শিক্ষার বিস্তৃত অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এটি (শিক্ষা) হল একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে এবং যার দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিশ্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে"। সুতরাং ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হ'ল সার্বিক বিকাশের সহায়ক একটি প্রক্রিয়া। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এ্যাডামস (*Adams*), নান (*Nunn*), দার্শনিক জন ডিউই (*John Dewey*) প্রমুখ অনেকেই শিক্ষা বলতে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থকে ব্যাখ্যা করে হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেছেন, "শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে এবং তা হল সর্বতোভাবে প্রকাশিত জীবন।" পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য শিক্ষাবিদ্ দার্শনিকদের মধ্যে পেস্তালাৎসি (*Pestalozzi*), ফ্রয়েবেল *(Froebel)*, রুশো (*Rousseau*), মন্টেগু (*Montaigue*), লক (*Locke*) প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্দের অনেকেই শিক্ষার ব্যাপক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্ত আত্মশক্তির বিকাশের কথাই বলেছেন।

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার বিচারে ভারতের স্থান অন্যতম। ভারতের মুনিঋষি ও মনীষীদের চিন্তাধারাতেও শিক্ষা বিষয়ক প্রত্যয় ও ব্যাপক অর্থের ব্যাঞ্জনা পাওয়া যায়। যেমন ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে তেমনি আবার আত্মোৎসর্গী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। বেদ উপনিষদের মতে শিক্ষা হল এমনই একটি প্রক্রিয়া যার পরিণতি হল মুক্তি

(Salvation)। বৈয়াকরণ পানিনির মতে, মানুষের শিক্ষা হল এক ধরনের অনুশীলন যা প্রকৃতির কাছ থেকে সে পেয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের অন্যতম দার্শনিক কণ্বাদ *(Kannad)* বলেন, শিক্ষা হল আত্মতৃপ্তির বিকাশ। সুবিখ্যাত ভারতীয় শাস্ত্রবিদ্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শিক্ষা হল এমনিই একটি বিষয় যার মাধ্যমে ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান হয় এবং বিশ্বজনের নিকট আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্য শিক্ষাকে আত্মোপলব্ধির উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল ধারা আধুনিক যুগেও অব্যাহত। শিক্ষার ব্যাপক অর্থের ব্যাঞ্জনা অব্যাহত রেখে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির প্রকাশ। এটাই শিক্ষার গোড়ার কথা—অন্তর্নিহিত সম্পদের প্রকাশ থেকে শিক্ষার যাত্রা শুরু করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে অন্তর সম্পদশালী হলে বহির্বিশ্বের যাবতীয় বিষয়কে মানুষ বাঞ্ছনীয় উপায়ে করায়ত্ত করতে পারে। তখন ঐতিহ্য ও আধুনিক মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় ঘটে—জীবন পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতে এটাই হল সম্পূর্ণ জীবন, পরিপূর্ণ শিক্ষা। তিনি বলেন, "Education should be in full touch with our complete life—economical, intellectual, aesthetic, social and spiritual."। গান্ধীজীও চেয়েছিলেন মানুষের জন্যে সম্পূর্ণ শিক্ষা। তাই তিনিও বলতেন—"By education, I mean an all round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit." অর্থাৎ শরীর, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ ও সুষমবিকাশ। গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন যে, "আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যান্ত্রিকতার প্রভাব সর্বাধিক। বস্তুমুখী শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটি মোটেই নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা বর্জন ক'রে নয়। বরং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করেই ব্যবহারিক ও প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা লাভ করাই বাঞ্ছনীয়। ঠিক একই সুরে সুর মিলিয়ে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার প্রাণপুরুষ ডঃ রাধাকৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—"ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে শিক্ষা কেবল মাত্র জীবিকার্জন নয় বা শুধু নাগরিকত্ব বিষয়ে সচেতনতা নয়। এটি হল আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা, সত্যের সন্ধানে মানবাত্মার শিক্ষণ (training) এবং ভাবজীবনের অনুশীলন, তাই শিক্ষা 'দ্বিজত্ব' দান করে।"[1] আজ বিশ্বের সকল চিন্তাবিদ্ পণ্ডিতগণ এক মত যে, শিক্ষা মূলতঃ সুসংহত জীবনপ্রণালী ও জাগতিক বিষয়াবলীর সমন্বিত চিত্রটিকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

---

1. Education according to Indian tradition is not merely a means of earning a living; nor it is only a nursery of thought or a school for Citizenship. It is initiation into the Life of spirit, a training to human souls in the persuit of Truth and the practice of virtue."

—*Radhakrishnan.*

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার যেসব সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল সেগুলির ভাবধারা বিচার করে বলা যায়, অধিকাংশ মানুষই মূলতঃ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের অজ্ঞাতসারে সেই শিক্ষা লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, সমাজস্তরে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও যোগাযোগ, জীবনের সুযোগ-সাফল্য, ব্যর্থতা ও দুর্ভোগ ইত্যাদি অবস্থা থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিয়ত শিক্ষালাভ করছে। তাই শিক্ষার ব্যাপকতর পরিকাঠামোতে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা (Incidental Education) বা স্বাভাবিক উপায়ে প্রাপ্ত শিক্ষাকে যেমন বুঝায় তেমনি আবার আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও এই ব্যাপক অর্থে গৃহীত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কারণ সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণার্থে বিশেষ সমাজশক্তি (Social force) হিসেবে পরিগণিত। তাই পুনরুক্তি করে বলতে হয়, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক।[1]

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল: প্রথমতঃ, শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বলে, জন্মের সময় থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতাময়। শিক্ষার শুরু মানব-শিশুর জন্ম থেকে আর শেষ তার মৃত্যুতে। তাই শিক্ষা জীবনব্যাপী অন্তহীন ও বিরামহীন একটি প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তার জীবনের সর্বস্তরে প্রসারিত। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে সাক্ষর ও নিরক্ষর বলে মানুষকে দুটি শ্রেণীতে আমরা ভাগ করতে পারি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এ ধরনের কোনো ভেদ মানুষের মধ্যে নেই, কেননা অভিজ্ঞতা নেই এ ধরনের মানুষও নেই। অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও শিক্ষিত হতে দোষ নেই। অভিজ্ঞতার অভিনবত্বই শিক্ষা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় প্রতিনিয়তই আমাদের হচ্ছে। একেই শিক্ষা বলে অভিহিত করা যায়।

তৃতীয়তঃ, যেহেতু অভিজ্ঞতাই শিক্ষা সেহেতু আমাদের আচরণের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব এই শিক্ষার আর এক বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতা যখন আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা পরিবর্তন ঘটায় তখনই অভিজ্ঞতা শিক্ষা পদবাচ্য। আমরা প্রতিমুহূর্তেই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করছি। পরমুহূর্তেই আবার সেগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে অথবা পরিত্যক্ত হচ্ছে। আর সেই শূন্যতায় আসছে নতুন অভিজ্ঞতা। এইভাবে মানবজীবনে অভিজ্ঞতার পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পুনর্গঠন চলছে। ব্যাপক অর্থে এই হল শিক্ষা।

চতুর্থতঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল সামাজিক প্রক্রিয়া। একদিকে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য

---

1. "Education is not a preparation for life, rather it is the living" — *John Dewey*

দিয়ে সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে আবার সমাজে প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি যে সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া সদাপ্রবহমান, প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেগুলির সবগুলিই সাধিত হয়। কাজেই দুদিক দিয়ে বিচার করলেই শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা যায়।

পঞ্চমত:, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে শুধু তথ্য আহরণকেই বোঝায় না। তথ্যকে বাস্তব আচরণে প্রয়োগ করতে পারলে তবেই সেই তথ্য বা অভিজ্ঞতা অর্থময় হয়। যে অভিজ্ঞতা জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না তা শিক্ষা পদবাচ্যও নয়।

ষষ্ঠতঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিসাধনে সাহায্য করে। ব্যক্তি যদি তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যথাযথভাবে খাপ খাওয়াতে না পারে তবে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। পরিবেশের তাগিদ অনুযায়ী ব্যক্তি যে নিজের আচরণ বা অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তন করে, ব্যাপক অর্থে তাই শিক্ষা।

সবশেষে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া। প্রকৃত শিক্ষায় শুধুমাত্র শিক্ষকের প্রভাবই যে শিক্ষার্থীর উপর কার্যকর হয় তাই নয়। শিক্ষার্থীও শিক্ষককে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া চলে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলই হল শিক্ষা। কাজেই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা একমুখী প্রক্রিয়া নয়। পরন্তু এটি একটি উভয়মুখী (Bi-polar) প্রক্রিয়া।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রক্রিয়া।

শিক্ষার পরিধি

(The Scope of Education)

একটি মানুষের সমগ্র জীবন-ব্যাপী শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে। তার ব্যক্তিক জীবনে বেঁচে থাকা, তার সামগ্রিক জীবনে বেঁচে থাকা শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। সমাজ কল্যাণ, সমাজের অগ্রগতি, সমাজ সংরক্ষণ-তাও তো শিক্ষার মধ্যেই পড়ে। তাই শিক্ষার পরিধি বিশাল ও ব্যাপক, তা মানব জীবন, মানব সভ্যতা ও মানব সংস্কৃতির সঙ্গে সমান্তরাল। শিক্ষার পরিধি কয়েক পাতায় লিখে আলোচনা করা যায় না। তবু আমরা চেষ্টা করব শিক্ষার পরিধি বলতে আমরা কোন্ কোন্ বিশেষ অংশগুলিকে চিহ্নিত করব।

শিক্ষার পরিধি বিশাল

প্রথমে একটি মানুষ, তার জীবনের কোন্ কোন্ দিকগুলিকে শিক্ষার আবশ্যিক ও প্রধান অঙ্গ বলব, তা ব্যাখ্যা করে নিই।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষা। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হল—তার দেহে, মনে, সামাজিক সত্তায়, নৈতিক ও আত্মিক জীবনে বেড়ে ওঠা। তাই শিক্ষার পরিধির মধ্যে প্রথমেই পড়ে শিক্ষার বিকাশের ক্রমে তার দেহ বা শারীরিক সত্তাপ্রসঙ্গ।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষা

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে একই কথা বলা হয়েছে—শরীর সুস্থ, সবল না হলে মন ও বুদ্ধির চর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রাচীন ভারত বললেন—'শারীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' (শরীর আগে, তার পরে অন্য ধর্ম সাধনা)। প্রাচীন গ্রীস দেশে **Plato Republic এ gymnasium** কে স্থান দিলেন সর্বাগ্রে। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক সপ্তদশ শতকে বলেছিলেন **'Sound mind resides in a sound body.** অর্থাৎ সুস্থ দেহেই সুস্থ মন থাকে'। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী দার্শনিক রুশো প্রকৃতিবাদী শিক্ষার সূচনা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষার গোড়ার কথাই হল—'Child is wicked as he is weak, make him strong and he will be good' অর্থাৎ শিশু যদি কিছু অন্যায় করে, তবে বুঝতে হবে সে শরীরে দুর্বল, তাকে সবল করে তোলো, সে ভাল আচরণ করবে। ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার একই কথা বলেছেন, **'Be a good animal first'** অর্থাৎ আগে জৈব জীবনটিকে সুস্থ ও সবল করো।' আধুনিক শিক্ষারও গোড়ার কথা—শরীর সুস্থ করা, সবল করা, ইন্দ্রিয়গুলির পরিচর্যা করা, তাদের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে তোলাই শিশুর বিকাশ সাধনের প্রথম পাঠ। তাই জীবনবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি শিক্ষার পরিধির মধ্যে পড়ে। জীবন বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়েছে —তার নানা শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হয়েছে, আমাদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবকথা বলে ওঠা সম্ভব হবে না, তবে মোটামুটি কয়েকটি বিষয় শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের অবশ্যই জানা প্রয়োজন। মানুষের জৈব জীবনের প্রধান অংশগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। শিশুর মস্তিষ্ক, তার গঠন, সুষুম্নাকাণ্ড, ইন্দ্রিয়বর্গ, গ্রন্থি ও সেগুলির কাজ, স্নায়ু, শিরা উপশিরা, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, জৈব অস্তিত্বের প্রধান প্রধান অংশ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে একটি শিশুর বিকাশ সাধনে সহায়তা করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ হবে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি দেহে আর একজনের থেকে পৃথক, তাই তাদের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও আলাদা হতে বাধ্য। বিশেষ করে ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দীপকে সাড়া দেবার ক্ষমতা, বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণের পরিমাণ সবার এক নয়। তাই এই ব্যক্তিমূলক বৈষম্য অনুযায়ী শিশুকে নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয়। আজকের জৈব বিজ্ঞানীরা ***'gene'***এর ওপর খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। বংশক্রমে পাওয়া এই 'জিন'ই মানুষের ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ, নানা শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বৈচিত্র্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে। শারীরিক নানা ব্যায়াম, খেলাধুলো, যোগ ইত্যাদিও শিক্ষারই অঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এখন এমন একদল যুবক যুবতী আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন, যাঁদের 'লৌহ সদৃশ মাংসপেশী ও ইস্পাতের মতো নার্ভ ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি যা অপ্রতিরোধ্য" ("Muscles of iron, nerves of steel and gigantic will which nothing can resist") এই অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তির উৎস শুধু মন নয়, তা দেহও বটে। মনের ভিত্তিভূমি তো দেহ, তাই দেহ যেমন মনের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল, মনও তেমনি দেহটির ওপর প্রতিক্রিয়া পরায়ণ। "Physiological Basis of Mental life' শীর্ষক বিষয়টিতে মন—তার নানা ক্রিয়াকলাপ দেহবৈচিত্র্য, দেহের বিভিন্ন অংশের মনের ওপর

দৈহিক দিক

জৈব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান

প্রভাব কিভাবে প্রকাশ পায় তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই জীবনবিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে।

এরপর মনের প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। শিক্ষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিকাশশীল ব্যক্তিত্বের মন ও তার বিশ্লেষণ। মনের প্রধানত তিনটি বিশেষ কাজ—জানা (to know), অনুভব করা (to feel) এবং করা (to do)। 'জানা' অংশটি বৌদ্ধিক ভাগ (intellectual aspect)। অনুভব করা হল প্রাক্ষোভিক ভাগ (emotional or affective aspect) আর কাজ করা হল (doing or conative aspect)। শিক্ষার পরিধির আবশ্যিক ভাগ হল মনের এই তিনটি দিক—তাদের বৈচিত্র্য, কর্মপ্রণালী, এসব বিষয়ে নানা নতুন নতুন আবিষ্কার। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে এগুলির প্রয়োগ ইত্যাদি। মনো বিজ্ঞানের এখন নানা শাখা যেমন— শিশু মনস্তত্ত্ব (child phychology), সাধারণ মনস্তত্ত্ব (general psychology), প্রয়োগমূলক মনস্তত্ত্ব (Applied psychology), শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology), সমাজতত্ত্বমূলক মনোবিজ্ঞান (Social psychology), আচরণমূলক মনোবিজ্ঞান (Behavioural Psychology), (Abnormal Psychology), শিল্পসংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Industrial Psychology) ইত্যাদি।

মন
জ্ঞান
অনুভব
প্রয়োগ

এই সমস্ত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল ব্যক্তিবৈষম্য ও পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী মনের বিশ্লেষণ করা ও প্রয়োজনে মানুষকে সুস্থ মনের অধিকারী করে তোলা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মনোবিজ্ঞান প্রধানতম অংশ। শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি, প্রবণতা, মনোযোগ, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব গঠন, বিভিন্ন বয়সে নানা মানসিক চাহিদা ইত্যাদি ইত্যাদি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয়। এছাড়া শ্রেণী শিক্ষাদানেও মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ শিক্ষকের কর্তব্য। এখন নির্দেশনা (counselling and guidance) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় সুস্থতা বজায় রাখার জন্য, শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন আনার জন্য মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা আজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকটিকে কেন্দ্র করে মনের চিকিৎসা শাস্ত্র (Psychiatry) গড়ে উঠেছে। আজ সমাজ জীবন বড় জটিল। এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে অতিরিক্ত মানসিক চাপ (Mental stress) সৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলে মনের নানা ব্যাধির শিকার হচ্ছে মানুষ। তাই ব্যক্তিনির্দেশনা বা দলগতভাবেও নির্দেশনা (guidance and counselling) এবং মনের চিকিৎসার নানা পদ্ধতি মনের সুস্থতা আনার জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন অভীক্ষার (Evaluation and Tests) ব্যবস্থা হয়েছে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে মনোবিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই শিক্ষার পরিধির বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে। দেহ ও মন পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল, তাই শরীর ও মন—দুটি

শিক্ষণ
প্রশাসন
প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান
মনশ্চিকিৎসক

সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই শিক্ষার উপজীব্য বিষয়, কারণ শিক্ষাই জীবন **(Education is life itself)**। মানুষের শরীর ও মন পরস্পর প্রতিক্রিয়া করছে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কে এসে। তাই এখন আমরা শিক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরছি।

নির্দেশনা

মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে চলেছে, কারণ মানুষের সামনে নানা উদ্দীপক (stimulants) এসে হাজির হচ্ছে। শিক্ষার আর এক নাম তাই সঙ্গতি বিধান (adjustment)—মানুষের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনই শিক্ষা *("Education is the unending process of adjustment with the ever-varying conditions of life")*। পরিবেশ বলতে বুঝি সেই সব অবস্থা যা মানুষকে ঘিরে রাখে (environs)। জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত উদ্দীপকের সমষ্টিগত উপাদান হল পরিবেশ *("Environment is the sumtotal of all the stimulations as received by an individual from cradle to cremation")* এই পরিবেশকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—একটি জৈব (Physical), দ্বিতীয়টি সামাজিক **(social)** এবং তৃতীয়টি মানসিক **(mental)**। জৈব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রথম অভিযোজন প্রক্রিয়া চলে এবং তা সারাজীবন ব্যাপী। আলো, বাতাস, গাছপালা, নদী পাহাড়, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, জন্তু সবই মানুষের চারিদিক ঘিরে রেখেছে। এদের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করাটাই বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত। আজ শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য হল এই জৈব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। তাই পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান **(Ecological science)** শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত।

সঙ্গতি বিধান

জৈব পরিবেশ

পরিবেশ বিজ্ঞান

সামাজিক পরিবেশ হল মানুষের চারিদিকের মানুষজন—তার পরিবার, বিদ্যালয়, ধর্মসংস্থা, রাষ্ট্র, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম। সমাজ সংরক্ষণ ও সামাজিক ঐতিহ্য সঞ্চালন এবং তার মধ্যে দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সামাজিক কল্যাণসাধন করা শিক্ষার কাজ। তাই শিক্ষার মধ্যে দিয়েই মানুষ সমাজ, সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তির ব্যবহার সব কিছু জানে। আবার সঞ্চালনমূলক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য, আবিষ্কার ও সামাজিক পরিবর্তনে ও রূপান্তরে সহায়তা করে। রাজনৈতিক চেতনা সমাজচেতনারই অঙ্গ, কারণ গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির প্রতিনিধি নির্বাচন করে জনগণই। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকার দরকার কারণ, মানসম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষাকে একটি Investment হিসাবে মনে করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য **Population Education** প্রয়োজন। তাই শিক্ষার পরিধির মধ্যে সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি পড়ে। আজকের শিক্ষার ধারা হল—De-schooling-স্কুল বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা, তার জন্য মুক্ত-শিক্ষা (open-school system) এবং দূর শিক্ষা

সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক নানা জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রাজনীতি

অর্থনীতি

প্রকল্প (Distance Education system) চালু হয়েছে। জনশিক্ষা বিস্তারের এই অভিনব ব্যবস্থা শিক্ষার অঙ্গবিশেষ। সমাজে অবহেলিত জনগণের শিক্ষা, নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি প্রকল্প, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সবই শিক্ষারই অঙ্গ। সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে এইটুকুই বলা হল। মানুষের মানসিক পরিবেশের সঙ্গে তার নিত্য অভিযোজন করতে হয়। মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, সামর্থ্য সব কিছুর সঙ্গে তাকে মানিয়ে নিতে হয়। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি।

জন শিক্ষামূলক প্রকল্প

অবহেলিত জনগণের শিক্ষা

মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক দিক ছাড়াও, তার নৈতিক ও আত্মিক অস্তিত্ব রয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধ নীতিরই অংশ। শিক্ষার একটি আবশ্যিক অঙ্গ হল মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত শুভ মূল্যবোধ গড়ে তোলা। সুস্থ মূল্যবোধই সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির চাবিকাঠি। আত্মার ঐশ্বর্য উপলব্ধি করাই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের উপায়। আত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য সৃজনশীল কাজকর্ম, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, নানা নান্দনিক বিষয়, দর্শনের বিভিন্ন দিক শিক্ষাকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যে দ্বিজ—জৈব পরিবেশে তার প্রথম জন্ম—তারপর তার জন্ম সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে। নীতিশিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান, নান্দনিক সমস্ত বিষয়ই শিক্ষার অলঙ্কার স্বরূপ। জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল বলেছিলেন 'God is a great mathematician'—তাঁর মতে গণিত, অঙ্কন, গান, বাজনা প্রকৃতিপাঠ সব কিছুই শিখবে শিশু কারণ আত্মবিকাশের পক্ষে এগুলিই প্রাথমিক উপাদান।

মূল্যবোধ বিষয়ক নানা শিক্ষা

আত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য সৃজনশীল ও নান্দনিক বিষয়

আজ বিশ্বায়ন আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, আমরা এখন বিশ্বনাগরিক। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে জীবনের সমস্ত দিক জুড়ে দেওয়া নেওয়ার বাতাবরণ। জীবন আজবৃহৎ হতে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ছুটে চলেছে। শিক্ষার পরিধিও সীমা ছাড়িয়ে কোথায় পৌছাচ্ছে তা মানুষের জ্ঞাত বিষয় নয়। মানুষের জীবনই যে শিক্ষা—তাই তার সীমা সীমাহীন।

প্রশ্নাবলি

১। শিক্ষা বলতে তুমি কী বোঝ?

২। 'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

৩। শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ কী? শিক্ষার ব্যাপক অর্থই বা কী?
(রবীন্দ্র ভারতী বি বি. এডঙ্গ ২০০১, ২০০০)

৪। "প্রকৃত শিক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়"—ব্যাখ্যা কর।
(ক. বি. জেলা -২০০০, অনার্স ২০০২, রবীন্দ্রভারতী বি। বি. এড ২০০৪।

৫। 'মানব জীবনের নিত্য পরিবর্তনশীল বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়ত অভিযোজনই শিক্ষা'—শিক্ষার অর্থ প্রসঙ্গে উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।
(ক. বি. বি. এড, ২০০২, ক. বি., অনার্স ২০০২)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল বৈশিষ্ট্য

(জ্ঞানতত্ত্বীয় এবং নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় দিক থেকে)

মানুষের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়া তার অবস্থানকে জড়বস্তু ও পশু অপেক্ষা পৃথক বলে নির্দেশ করে। এই বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল, জ্ঞান অর্জন বা জানা। মানুষ সবকিছুকে জানতে চায়। এই জানার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে দর্শন ও বিজ্ঞান। শুরুতে জ্ঞানের এই শাখা দুটি পৃথক ছিল না। যাকেই দর্শন বলা হত তাই-ই ছিল বিজ্ঞান। মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই প্রাচ্যে সিন্ধুনদের ধারে ও মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়া মাইনর ও নীলনদের ধারে প্রথম যে মানব সভ্যতার উন্মেষ হয় তার মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বজগৎকে জানা, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ। তাই Philosophy শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। গ্রিক ভাষায় Phil শব্দটির অর্থ হল অনুরূপ, sophia অর্থ হল জ্ঞান। অনুরূপভাবে ভারতীয় দর্শনে 'দর্শন' শব্দটির অর্থ হল 'দেখা'। 'দেখা' মানে নিজের জীবনে উপলব্ধি করা। Education শব্দটির ব্যাপক অর্থ হল মানবের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ সাধন বা উন্নয়ন। অর্থাৎ দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য হল পরস্পরের পরিপূরক। নিজের জীবনে উপলব্ধ গুণগুলির বিকাশ সাধন। তাই ভারতীয় দর্শন যেন জীবন কথা বা জীবন দর্শন।

ভারতীয় দর্শনের উৎস হল বেদ। কেউ বেদকে স্বীকার করেন, আবার কেউ কেউ বেদকে অস্বীকারও করেন। যাঁরা বেদকে স্বীকার করেন তাঁরা হলেন আস্তিক সম্প্রদায়, এবং যাঁরা বেদকে অস্বীকার করেন তাঁরা হলেন নাস্তিক সম্প্রদায়। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মতাবলম্বীরা হলেন নাস্তিক সম্প্রদায় এবং সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-ন্যায় ও বেদান্তবাদীরা হলেন আস্তিক সম্প্রদায়।

ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বা তত্ত্বগত বিষয় নয়, মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। মানুষ, ভারতীয় দার্শনিকদের মতে শুধু প্রাণীই (Animal) নয়, বৌদ্ধিক প্রাণী বা যুক্তি-বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী (Rational Animal)। অর্থাৎ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কীভাবে আরও উন্নততরভাবে বেঁচে থাকা যায় এটাই তার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে তার জীবনদর্শন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের চারটি বিষয় মানুষের বিশেষ প্রয়োজন, যথা—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তাই মানুষ এই বিষয়গুলিকে পরমপ্রিয় বলে মনে করে এগুলিকে পুরুষার্থ বলে।

ভারতীয় দর্শন লক্ষ্যে, অনুভূতিতে পাওয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদে এই তত্ত্ব বা সত্যগুলি সূত্রের আকারে লিপিবদ্ধ আছে। তাই বেদকে আশ্রয় করে ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনচর্চা করেছেন। আশ্রয় বলতে বেদকে স্বীকার-অস্বীকার দুই-ই বোঝানো হয়েছে।

চার্বাক দর্শন

ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্প্রদায় হল চার্বাক। কেউ বলেন চার্বাক নামক ব্যক্তি এই দর্শনের প্রণেতা, আবার কেউ বলেন চার্বাক পদ্ধতি এসেছে চারু+বাক্ শব্দ থেকে আর্থাৎ চারু বা রমণীয় বাক্য চার্বাক দর্শনে আছে তাই জনসাধারণের কাছে এই দর্শন সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য দর্শন। এই দর্শন লোকায়ত দর্শন নামে পরিচিত।

চার্বাকগণ মনে করেন প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। তারা প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুগুলিকে গ্রহণ করেন। অনুমানকে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বলে অন্য সকল দার্শনিক সম্প্রদায় স্বীকার করলেও চার্বাকবাদীরা অনুমানকে স্বীকার করেন না। অনুমানে জানার উপর ভিত্তি করে অজানায় যাওয়ার পদ্ধতি, এই অজানায় অপ্রত্যক্ষে যাওয়া চার্বাক মতে সম্ভব নয়। তাঁরা শাব্দিক জ্ঞান স্বীকার করেন না, কারণ শাব্দিক জ্ঞান অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা যেহেতু প্রত্যক্ষবাদী—তাই দেহ-অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে বিশ্বজগৎ হল—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ-এর সমাহারে বা সমন্বয়ে গঠিত। ব্যোম, দিক, কাল, মন ও আত্মা দেখা যায় না বলে স্বীকার করে না। আত্মা হল দেহ; পান ও চুনের সমাহারে যেমন রক্তবর্ণের উৎপত্তি তেমনি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুতের সমাহারে আত্ম-অতিরিক্ত চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। এই ধারণাকে ভূত-চৈতন্যবাদ বলা হয়।

অর্থ ও কামকেই চার্বাকবাদীগণ প্রিয় বস্তু বলে মনে করেন। স্বর্গ বা মোক্ষলাভকে তাঁরা অলীক কল্পনা বলে মনে করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেখানে স্বীকৃত নয়, সেখানে কর্মবাদও প্রযোজ্য নয়। তাঁদের বক্তব্য হল 'যাবৎ জীবে সুখং জীবেৎ' (Eat, drink and be merry for tomorrow we may die)।

বৌদ্ধ দর্শন

খ্রিস্টধর্মের প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বৌদ্ধ দর্শন মূলত গৌতমবুদ্ধের উপদেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই দর্শনের মূল বক্তব্য তিনটি পিটকের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। গৌতমবুদ্ধের উপলব্ধ বিষয়কে বৌদ্ধগণ চারটি আর্যসত্যের

উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, দুঃখ থেকে নিবৃত্তির উপায় আছে। বৌদ্ধমতে কারণ ব্যতিরেকে কোনো কিছুরই উৎপত্তি হতে পারে না। এই মতবাদকে প্রতীত্য সমুৎপাদোবাদ বলা হয়। অর্থাৎ, কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে কোনো কিছু উৎপাদিত হয়। বৌদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদোবাদ ক্ষণিকবাদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণিকবাদে স্বীকার করা হয় জগতের প্রতিটি বস্তু ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্ত ক্ষণ অবস্থান করে কার্য উৎপাদন করে বস্তুটি অন্তর্হিত হয় বা রূপান্তরিত (রূপান্তর) হয়। তাই বৌদ্ধগণ নিত্য, অবিনাশী আত্মায় বিশ্বাস করে না। তাদের মতে আত্মা হল চেতনা প্রবাহ (Stream of Consciousness)। তাই এঁদের নৈরাত্মবাদীও বলা হয়। নিত্য কোনো আত্মা নেই, অন্তর জগতে যা পাই তাহল ক্ষণিক বিজ্ঞান (Consciousness)। পূর্ব বিজ্ঞান উত্তর বিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে। পূর্ব বিজ্ঞানে আশ্রিত সংস্কারগুলি উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রামিত (Transsmitted) হয়। এভাবে তার স্মৃতি ব্যাখা করে। কর্মবাদও এরূপভাবেই স্বীকৃত। বাসনাও পূর্ব বিজ্ঞান থেকে উত্তর বিজ্ঞানে গমন করে, তাই পূর্বজন্মের ফল এ জন্মেও ভোগ করা হয়। একটি মোমবাতি থেকে যেমন আর একটি মোমবাতি প্রজ্বলিত করা হয় তেমন এ জন্মের শেষ বিজ্ঞান থেকে পরজন্মের বিজ্ঞানের শুরু। কর্মফল নিবৃত্ত হলে তবেই মানুষ জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান। মহাযান ও হীনযান। মহাযান সম্প্রদায় আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যে মূলত কোনো প্রভেদ নেই। উভয়েই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অবভাসরূপে স্বীকার করে। শূন্যবাদী মতে সেই অবভাসের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না অর্থাৎ শূন্য। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী মতে বিজ্ঞান বা consciousness হল সৎ, জগৎ বিষয়রূপে প্রতিভাত হলেও তার সত্তা নেই।

হীনযান বৌদ্ধগণ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। সৌত্রান্ত্রিক ও বৈভাষিক। সৌত্রান্ত্রিকগণ বলেন বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও তা অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু বৈভাষিক মতে বাহ্য বস্তুর জগৎকে আমরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে জানতে পারি। বৈভাষিক সম্প্রদায় পরমাণুবাদী। প্রত্যেক বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য পরমাণুতে বিভক্ত করা যায়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় কিন্তু পরমাণুপুঞ্জ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

জৈন দর্শন

জৈন দর্শনও বৌদ্ধ দর্শনের মতো মুক্ত জ্ঞানী পুরুষদের উপলব্ধ সত্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ঋষভদেব হলেন সর্বপ্রথম তীর্থংকর এবং মহাবীর হলেন সর্বশেষ

তীর্থংকর। তীর্থংকরগণ প্রথম জীবনে বদ্ধজীব কিন্তু পরবর্তী জীবনে নিজেদের চেষ্টায় পূর্ণ, মুক্ত ও সর্বজ্ঞ হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন এইভাবে যে কোন জীবই নিজের চেষ্টায় পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হতে পারে। পূর্ণ, মুক্ত ও সর্বজ্ঞ তীর্থংকর 'জিন' নামে পরিচিত, অর্থাৎ যাঁরা রাগ, দ্বেষ ও অন্যান্য বন্ধনের কারণকে জয় করেছেন। এঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তীর্থংকরগণই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত। কেউ কেউ মনে করেন 'জিন' শব্দ থেকে 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি।

পরবর্তীকালে জৈনগণ 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। মূল দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে এঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দিগম্বরগণ অত্যন্ত গোঁড়া। তাঁরা সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত। তাঁরা মনে করেন বস্ত্র পরিধানও আসক্তির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় মনে করেন শ্বেতবস্ত্র পরিধানে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। দিগম্বরগণ নারী জাতির মোক্ষলাভের বিরোধী। নারীকে মোক্ষলাভ করতে হলে তাকে পুনরায় পুরুষরূপে জন্ম নিতে হবে। শ্বেতাম্বরগণ এই মত মানেন না।

জৈন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদকে বস্তুবাদ বলে। কারণ তাঁরা জাগতিক বস্তুর মন-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা আছে বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা ভিন্নভিন্ন আত্মা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জীবের আত্মার পরমত্ব স্বীকার করেছেন। প্রতিটি জীবে আত্মা স্বীকার করার ফলে জৈন দর্শনে অহিংসনীতির সার্বত্রিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সর্বজীবে অহিংসা ও পরমতসহিষ্ণুতা তাঁদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের মূল ভিত্তি। তাঁদের তাত্ত্বিক মতবাদ 'অনেকান্তবাদ' ও যৌক্তিক মতবাদ 'স্যাদ্‌বাদ' নামে পরিচিত।

জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে জৈনদর্শনে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে যখন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাঁদের মতে আত্মা স্বরূপত সর্বজ্ঞ। কিন্তু জীবের কর্ম বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পরিমাপে চৈতন্যকে আবৃত করে রাখে।

জৈনগণ যথার্থ জ্ঞানকে পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে দুইবার ভেদ করেছেন। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি লব্ধ জ্ঞানকে অপরোক্ষ ও অনুমানাদিকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। কিন্তু জৈনমতে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হল পরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা লব্ধ না হয়ে আত্মার দ্বারা লব্ধ। যদিও জৈন দার্শনিকগণ জ্ঞানকে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু যৌক্তিক দিক থেকে তাঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান

ও শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে পরোক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য বিনাই জ্ঞান, কিন্তু অপরের কথা শুনে বা গ্রন্থপাঠ করে যে জ্ঞান তা হল শ্রুতজ্ঞান।

অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল তিন প্রকার। অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল জ্ঞান— (১) অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে অতীত, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম ও বহুদূরবর্তী বস্তুর যে জ্ঞান তাকে বলে অবধি। (২) যে অসাধারণ জ্ঞানের দ্বারা অপরের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা হয় তাকে বলে মনঃপর্যায় (telepathy)। (৩) আত্মা যখন বস্তুকে সরাসরি জানে তাকে বলা হয় কেবল জ্ঞান।

জৈনদের পরমতসহিষ্ণুতা তাদের যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক চিন্তা ধারণায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের যৌক্তিক মতবাদ, 'স্যাদ্‌বাদ' এবং তাত্ত্বিক মতবাদ 'অনেকান্তবাদ' নামে পরিচিতি।

'স্যাদ্‌বাদ' সাধারণ জীবের বচনের (judgement) আপেক্ষিকতা বা আংশিক সত্যতাকে নির্দেশ করে। সিদ্ধ পুরুষ কেবল জ্ঞানের দ্বারা সর্বধর্মবিশিষ্ট বস্তুকে জানতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জ্ঞান হল আংশিক বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান। একে জৈন দার্শনিকগণ 'নয়' নামে উল্লেখ করেছেন। 'নয়' হল বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুকে দেখা। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি বস্তুকে দেখিনা কেন, সেই জ্ঞান যথার্থ। এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য জৈনগণ কয়েকজন অন্ধব্যক্তির হাতি দেখার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

'স্যাৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'হয়তো' বা 'হতে পারে'। তাঁরা জীবনের সকল প্রকার চিন্তাকে সাতটি বচনের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। (১) 'স্যাৎঅস্তি'—একটি বস্তুতে একটি ধর্ম আছে। এটি বিশেষ স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করা হয়। (২) 'স্যাৎনাস্তি'—একটি বস্তুতে একটি ধর্ম নাও থাকতে পারে। (৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ—এখানে একটি ধর্মের স্বীকৃতি ও অন্যধর্মের অনুপস্থিতি বোঝায়। (৪) 'স্যাৎ-অবক্তব্যম'—স্থান-কাল নিরপেক্ষরূপে কোন বস্তুতে একটি ধর্মের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি কিছুই বলা যায় না। (৫) স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম চ—দেশ কাল সাপেক্ষে যখন একটি বস্তুতে একটি ধর্মের উপস্থিত বোঝান হয় দেশকাল নিরপেক্ষভাবে ঐ বস্তুটি অবর্ণনীয়। (৬) স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম চ—দেশকাল নিরপেক্ষভাবে কোনো বস্তুর অবর্ণনীয়তা যদিও দেশকাল সাপেক্ষভাবে তার অস্বীকৃতি থাকে। (৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম চ—নির্দিষ্টকালে যখন কোনো বস্তুর স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি থাকে, তখন দেশকাল নিরপেক্ষভাবে তা অবর্ণনীয় (একটি সর্বকে সৎও বলা যায় আবার অসৎও বলা যায়)। জৈন স্যাদবাদের মধ্য দিয়ে অনেকান্তবাদের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রকাশিত হয়। অনেকান্ত অর্থ হল অনেকদিন বিশিষ্ট। তাঁরা মনে করেন বহু দিক থেকেই পরম সত্যকে ব্যাখ্যা করা যায়।

তাঁদের মতে দ্রব্য দু'প্রকার ; স্থূল (অস্তিকায়) ও সূক্ষ্ম (অনস্তিকায়)। অস্তিকায় দু'প্রকার, জীব ও অজীব। যে দ্রব্যের স্বরূপ হল চেতনা তাকে জীব বলা হয়। জৈন মতে আত্মা ও জীব সমার্থক। অজীব দুই প্রকার, অণু ও সংঘাত।

জড় দ্রব্যের ক্রমবিভাজনের ফলে সৃষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশটি হল অণু। সংঘাত ও অণু দু'প্রকার দ্রব্যই চারটি গুণবিশিষ্ট। স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ।

কর্মই হল জীবের বন্ধন। কর্মের জন্য আসক্তি, আসক্তির জন্য দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে দেহ প্রাপ্তি ও বন্ধন। সম্যক্ জ্ঞান লাভই মুক্তিলাভের উপায়। সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌দর্শন ও সম্যক্‌চরিত্র মানুষকে মুক্তির পথে চালিত করে। অহিংসা হল তাঁদের মূলমন্ত্র।

বেদে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা

বৈদিক দর্শনের ভিত্তিতেই শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেই সময় শিক্ষার আদর্শ ছিল বেদ অনুসারী। বৈদিক শিক্ষার মূল আদর্শ ছিল আত্মোৎসর্গের আদর্শ। আত্মোৎসর্গের শিক্ষা হল পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ পরিশোধের জন্য পিতৃত্ব, যজ্ঞ এবং অধ্যয়ন ইত্যাদি বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করা। যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে, বিশ্বকে তথা ব্রহ্মকে অনুভবনের দ্বারা মোক্ষ লাভ করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

তবে বৈদিক ঋষি ইহজীবনকে অস্বীকার করে পারলৌকিক জীবনের কথা বলেন নি। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মারই সৃষ্টি, সুতরাং সুষ্ঠুভাবে জীবনধর্ম পালনের কথাও বৈদিক শিক্ষায় বলা হয়েছে। কাজেই পার্থিব দায়দায়িত্বের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সেজন্য জ্ঞানদান, শিক্ষাদানের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়েছে। অধ্যয়ন, শিক্ষা ও বিনয় এই তিনরূপেই শিক্ষাকে গণ্য করা হত। বৈদিক ঋষিগণ সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই শিষ্যকে পুত্র, স্বামী এবং পিতা হিসাবে কর্তব্যের শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজ জীবনের কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হত না বলেই দণ্ডনীতি, ধনুর্বিদ্যা, নানাধরনের সামাজিক বিধি-বিধান এবং নানাধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা ছিল। চরিত্র বলতে জ্ঞানবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করা হত বলে নৈতিক শিক্ষা ; নিয়মানুবর্তিতা ও ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ছিল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চরম জ্ঞানলাভ ও দায়িত্ব পালনের শিক্ষা—এই দুই উদ্দেশ্যকে সফল করে

তোলার জন্য বিদ্যাকে দুইভাবে পরিবেশন করা হত। পরম জ্ঞানের জন্য তিন বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত চর্চার ব্যবস্থা ছিল। আত্মসংযম ও যোগসাধনের মাধ্যমে এই বিদ্যালাভ করতে হত। একেই বলা হয় 'পরাবিদ্যা'। অপরদিকে পার্থিব দায়দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুশীলনকে 'অপরাবিদ্যা' হিসাবে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। 'পরা-অপরা'র সার্থক সমন্বয়ে বৈদিক শিক্ষাকে সফল করে তোলা হয়েছে। পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, আচরণবিধি, শিক্ষালয় প্রভৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়েই শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা হয়েছে।

বৈদিক ন্যায়, সাংখ্য ও যোগ শাখার মূল বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষাচিন্তায় তাদের প্রভাব, বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানতে এবং সত্যজ্ঞান লাভের জন্য ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা সবসময় চেষ্টা করেছে। এই শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল সাংখ্যদর্শন। কপিল মুনি ছিলেন সাংখ্যদর্শনের প্রথম প্রবক্তা। পরবর্তীকালে কপিলমুনির শিষ্য-প্রশিষ্য অনুসারীবৃন্দের মাধ্যমে সাংখ্যদর্শনের বিস্তৃতি ঘটে। অনেকে বলেন 'সাংখ্য' শব্দটি এসেছে 'সংখ্যা' শব্দটি থেকে। আবার অন্যেরা বলেন সংখ্যা শব্দটির অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান। যে শাস্ত্র সম্যক্‌জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে সেই শাস্ত্রকে বলা হয় সাংখ্য।

সাংখ্যদর্শনে কার্য-কারণকে বলা হয়েছে সৎকার্য হিসাবে। প্রকৃতিতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল এই সৎকার্যবাদ। প্রকৃতিতত্ত্ব সম্পর্কে সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন—কারণ ব্যতিরেকে কার্য সাধন সম্ভব নয়। যেমন বীজের মধ্যেই নিহিত থাকে জীবনের সম্ভাবনা, অন্ধকারের কারণেই আলোর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। মাটি আছে বলেই মৃৎপাত্র নির্মাণ সম্ভব ইত্যাদি। এই কার্য-কারণের সম্পর্ককে আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে কার্য-কারণ সম্পর্ক অপরিহার্য। প্রস্তর থেকে অন্ন প্রস্তুত হয় না। তণ্ডুল থেকে তাম্র প্রস্তুত হয়, বালি থেকে ক্ষীর প্রস্তুত হয় না, দুধ থেকেই ক্ষীর প্রস্তুত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, কোনো কোনো বিশেষ কার্য বিশেষ বিশেষ কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেমন তুলো থেকে সূতা, সূতা থেকে বস্ত্র ইত্যাদি। সমস্ত রকম কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং পরে তা প্রকাশিত হয়ে ওঠে। শূন্য থেকে কিছু ঘটে না। প্রতিটি কার্যের পিছনেই কারণের অস্তিত্ব নিহিত থাকে। কার্য-কারণ উভয়েই সমধর্মী, একে অপরের পরিপূরক।

আমাদের এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কার্যেরই সমাহার। তাহলে সেই কার্যের কারণও অবশ্যই আছে। সাংখ্যদর্শনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুটি বিশেষ তত্ত্ব এই বিশ্বে

সৃষ্টির উৎস। সেই দুটি বিশেষ তত্ত্ব হল পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি এই জড় পৃথিবীর সৃষ্টির প্রেরণাশক্তিরূপে কাজ করে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি তিনটি গুণের সমাহার ঃ 'সত্ত্ব', 'রজ' ও 'তম'। এই তিনটি গুণই একত্রে সৃষ্টির প্রধান উপাদান। প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও তিনটি গুণই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন এবং ঐক্যবদ্ধ চালিকা শক্তি। সত্ত্বগুণ হল প্রীতি ও কার্য প্রকাশ, রজগুণ হল অপ্রীতি ও কার্য প্রবৃত্তি এবং তমগুণ হল বিষাদ ও কার্যাবরণ। এই তিনটি গুণই একসঙ্গে থাকে। প্রতিটি গুণের কার্যের মধ্যে তিনটি গুণই বর্তমান থাকে। যখন যে গুণের প্রাধান্য বেশি থাকে তখন সেই গুণের কার্য বলা হয়। প্রকৃতির যে উপাদানে সুখের প্রাবল্য তাকে বলা হয় সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ স্বভাবে লঘু ও প্রকাশোন্মুখ, আলোকিত ও পবিত্র। রজগুণ গতি ও চঞ্চলতার কারণ। জীবনের দুঃখের কারণও রজগুণ। রজ নিজেই দুঃখস্বরূপ। তমগুণ হল বস্তুর জড়তার কারণ। মন, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রকাশ ক্ষমতাকে ঢেকে রাখাই তমগুণের কাজ। মোহ, আলস্য, অহেতুক নিদ্রাবিষাদ ইত্যাদি তমগুণই সৃষ্টি করে থাকে। বিশ্বের সর্বত্র এই তিন গুণ বর্তমান থাকে। কোনোকিছুর প্রকৃতি এই তিনগুণের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গুণের উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। তবে এরা নিয়ত পরিবর্তনশীল আর তাই পরিবর্তনশীলতাই এদের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিতে সাধারণত এই তিনগুণ সমানভাবে থাকে।

সাংখ্যমতে 'পুরুষ' হল অপর প্রধান তত্ত্ব। পুরুষ হল সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ চিৎ স্বরূপ আনন্দময়, সচেতন, অপরিবর্তনীয় ও নিষ্ক্রিয়। সমস্ত রকম জাগতিক মোহ-সুখ-দুঃখের অনুভূত থেকে পুরুষ মুক্ত। সাংখ্যদর্শনে আত্মার বহুত্বের কথা বলা হয়েছে এবং গুণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ব্যাপারটিও রয়েছে যা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সাংখ্যমতে জড় প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের মিলনেই বিশ্ববিবর্তন সম্ভব হয়। বুদ্ধির সৃষ্টি প্রকৃতি থেকে। সত্ত্বগুণের প্রভাবে বুদ্ধির সৃষ্টি। মানুষকে নিশ্চয়তা ও নির্দেশনা দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের অন্যগুণও প্রকাশ পায়। কোনো কোনো বুদ্ধি তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তার ফলে বুদ্ধির জায়গায় দুর্বুদ্ধি স্থান করে নেয় এবং মানুষকে বিপথে চালিত করে। আবার বুদ্ধি থেকে অহংকারের সৃষ্টি হয়।

সাংখ্যমতে জ্ঞানতত্ত্ব হল কোনো বস্তুর বিশেষ ও সত্যজ্ঞান। বুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই মানুষের চৈতন্য জাগরিত হয় এবং মানুষ সত্য জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞান জাগরিত হয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগে, এই সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তুর অতিরিক্ত একটি প্রভাব পড়ে। এই প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে মন বুদ্ধির সাহায্যে। বুদ্ধি সত্ত্বগুণ থাকার ফলে মানবাত্মার চেতন

অংশে প্রতিফলিত হয় ও সেই প্রতিফলনের মাধ্যমে বস্তুটি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভ হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজ্ঞান—এই তিন উৎসের মাধ্যমে মানুষের জানার কাজটি সম্পন্ন হয়।

যোগদর্শন

যোগদর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলি ঋষি। এই যোগদর্শনে জীবনযাপনের আদর্শ পদ্ধতি, উপায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের জ্ঞানতত্ত্বকে অনুসরণ করেছে, তাই সাংখ্যদর্শনের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দকে গ্রহণ করেছে। যোগদর্শনের মূল বক্তব্য হল সব রকমের জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণা থেকে জীবাত্মার মুক্তি। যোগদর্শনের মধ্যে বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিদ্যার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ আমরা যোগদর্শনে দেখতে পাই। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক ও বিশ্ব-সংস্কারক হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে যোগদর্শন বিশ্বাসী। যোগদর্শনে সুস্থ শরীর ও মন গঠন করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সুস্থ দেহ-মনই পারে রোগ, দুঃখ, দোষ থেকে মুক্ত জীবকে পরম শান্তি দিতে।

ন্যায়-বৈশেষিক

আস্তিক দর্শন বা বৈদিক দর্শন বলতে আমরা বুঝি যারা বেদে বিশ্বাসী। বৈদিক দর্শন আবার দু'প্রকার বেদাশ্রিত ও বেদনিরপেক্ষ। বেদাশ্রিত দর্শনগুলি বেদের উপর নির্ভরশীল কিন্তু বেদনিরপেক্ষ দর্শনগুলি স্বাধীন যুক্তি তর্কের সাহায্যে বৈদিক তত্ত্ব বা সত্যগুলি প্রতিষ্ঠা করে। বৈশেষিক ও ন্যায় হল বেদনিরপেক্ষ দর্শন।

বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন একই ধরনের বিশ্বতত্ত্ব বা 'পদার্থতত্ত্ব' স্বীকার করেন বলে তাদের সমানতন্ত্রী বলা হয়। প্রধান বিষয়ে তারা একমত কিন্তু অপ্রধান বিষয়ে পার্থক্য আছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কণাদ। কথিত আছে—তিনি কাম্যকণা থেকে জীবনধারণ করতেন তাই তার নাম হল কণাদ। বৈশেষিক জ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ হল প্রশস্তপাদ ঋষির 'পদার্থ-ধর্মসংগ্রহ'। বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের সংমিশ্রিত গ্রন্থগুলি হল সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ভাষাপরিচ্ছেদ ইত্যাদি।

ন্যায়দর্শন ষোলটি পদার্থ স্বীকার করলেও বৈশেষিকগণ সাতটি পদার্থ স্বীকার করেন। যেমন, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, বিশেষ, সামান্য, সমবায় ও অভাব। কারোর মতে কণাদ ছয়টি পদার্থ স্বীকার করতেন, পরবর্তী বৈশেষিকগণ আর একটি পদার্থ (অভাব) যোগ করেছেন।

দ্রব্য হল গুণ ও কর্মের আশ্রয়। আবির্ভাব পর্যায়ে দ্রব্য গুণহীন পর্যায়ে থাকে। দ্রব্য হল গুণ ও কর্মের আধার নিত্য পদার্থ গুণ ও ক্রিয়ার সাক্ষাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে

দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দিক, কাল, আত্মা ও মন। প্রথম পাঁচটি দ্রব্যকে বলা হয় পঞ্চভূত। এগুলি ভৌতিক পদার্থ। প্রত্যেক পদার্থের একটি বিশেষ গুণ আছে যেমন ক্ষিতির গন্ধ, অপের রস, তেজের রূপ, মরুতের স্পর্শ ও ব্যোমের শব্দ। তার মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুতের দুই প্রকার অবস্থা আছে—নিত্য ও অনিত্য বৈশেষিকগণ নিত্য বলতে বোঝান যার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। ক্ষিতি ইত্যাদি দ্রব্যের অসংখ্য পরমাণু আছে তাই এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণুগুলি বৈশেষিক মতে অবিভাজ্য ও নিরংশ। এরা অতীন্দ্রিয়, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়। তাদের মতে ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, প্রথমে দুটি সমজাতীয় পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন হয় দ্ব্যণুক, আবার জীবের অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের প্রযত্নে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়ে ত্রসরেণু ও অন্যান্য পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হয়, আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুতে ক্রিয়া সঞ্চারিত হয়ে পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ হয়। পৃথিবীর যাবতীয় ভৌতদ্রব্য অবয়ববিশিষ্ট, এই প্রকার বস্তু অবয়বসমূহে বিভাজ্য। যদি নিরাবয়ব কণারূপে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয় তাহলে প্রতিটি অবয়বীই অন্তত অবয়ব বিশিষ্ট হয়ে পড়ে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তুর পার্থক্য করা যায় না।

বৈশেষিক দার্শনিকগণ পরমাণুকে জগতের আদি উপাদান বলেছেন। তাঁরা গ্রিকদের মতো পরমাণুর মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্যই শুধু স্বীকার করেননি, গুণগত পার্থক্যও স্বীকার করেছেন। গ্রিক মতে পরমাণুগুলি স্বভাবই গতিশীল ও সক্রিয়। অর্থাৎ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক মতে জগৎ সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর পরমাণুর মধ্যে গতির সঞ্চার করেন।

বৈশেষিক মতে আকাশ, দিক ও কাল প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য নয়। শব্দ থেকে আকাশকে, নিকট-দূর প্রভৃতি ব্যবহার থেকে দিক এবং বর্তমান, অতীত ব্যবহার থেকে কালকে অনুমান করা হয়। আকাশ, কাল ও দিক নিত্য সর্বব্যাপী দ্রব্য। এরা এক একটি ভিন্ন পদার্থ।

আত্মা হল জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য। বৈশেষিক মতে আত্মা অনুমেয় মাত্র, জীবাত্মা বহু, শরীর ভেদে জীবাত্মার ভেদ স্বীকার করতে হয়। আত্মা নিত্য ও বিভু।

বৈশেষিক মতে মন নবম দ্রব্য। পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার সংযোগ সবসময় থাকে তবু আমাদের জ্ঞান হয় না ; তাই আমাদের এমন একটি দ্রব্য স্বীকার করতে হবে যা আত্মা থেকে ভিন্ন এবং যে আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যম হিসাবে শব্দ

কাজ করতে পারে। মন হল এরূপ দ্রব্য। মন নিত্য, মূর্ত, নিরবয়ব এবং অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ হওয়ায় একটির বেশি বিষয়ের সঙ্গে তার সংযোগ থাকে না। তখন মন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তার জ্ঞান হয়। মন যেমন দ্রব্য তেমনি মন সুখদুঃখাদির মানস জ্ঞানের কারণ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে গুণ হল পদার্থ যা কর্মভিন্ন দ্রব্যে আশ্রিত থাকে। গুণের কোনো গুণ হয় না, গুণ হল অগুণবান। তাঁদের মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম হল জাতি-বিশিষ্ট। দ্রব্য ও কর্ম ব্যতিরেকে যা জাতিমান তাই হল গুণ। গুণ চব্বিশ প্রকার ঃ (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পৃথকত্ব, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ, (১৭) প্রযত্ন, (১৮) গুরুত্ব, (১৯) দ্রবত্ব, (২০) স্নেহ, (২১) সংস্কার, (২২) ধর্ম, (২৩) অধর্ম ও (২৪) শব্দ তাঁরা স্বীকার করেন মৌলিক গুণগুলির উপরিভাগ আছে।

গুণের মতো দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ হল কর্ম, কিন্তু কর্ম হল সক্রিয় ও গতিবোধক। কর্ম কেবলমাত্র ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি মূর্ত দ্রব্যে থাকে, আকাশ, কাল, আত্মা প্রভৃতি অমূর্ত দ্রব্যে থাকে না। এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সংযোগ। বিভাগ ও গুণ নিষ্ক্রিয় তাই কর্মই হল বেগের কারণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার ঃ (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ ও (৫) গমন।

বৈশেষিকগণ মনে করেন সামান্য বলে কোনো পদার্থ স্বীকার করা না হলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না। 'মানুষ', 'গরু', 'অশ্ব' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা একজাতীয় প্রাণীকে নির্দেশ করি কারণ তাদের ব্যবহারে ঐক্য অনুগততা দেখে, তাই বিশ্বনাথ নামে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বলেন 'যে ধর্ম নিত্য ও অনেকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে তাই সামান্য। সংযোগ দুটি পদার্থের মধ্যে থাকে, কিন্তু সংযোগ নিত্য নয়। আকাশ নিত্য কিন্তু অনেক সমবেত নয়, অত্যন্তাভাব সমবায় সম্বন্ধে থাকে না তাই সামান্য নয়। বৈশেষিক মতে সামান্য এক ও নিত্য, যে ব্যক্তিতে সামান্য আশ্রিত তা অনিত্য ও বহু হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির বিনাশে সামান্যের বিনাশ হয় না, উৎপত্তিতে ব্যক্তির উৎপত্তি হয় না।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে বিশেষ একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য। কেউ কেউ বলেন বিশেষ পদের স্বীকৃতি থেকে বৈশেষিক নামকরণ হয়েছে। বিশেষ পদার্থ ব্যাবৃত্তি প্রতীতির হেতু। যে পদার্থ নিত্যদ্রব্যে বর্তমান থেকে তাদের সর্বশেষ পারস্পরিক ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি সম্ভব হয় বিশেষ পদার্থ তার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। প্রতিটি আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ পদার্থ থাকায় অসংখ্য আশ্রয়ে অসংখ্য বিশেষ পদার্থ স্বীকার করতে হয়।

প্রতিটি বিশেষ নিজেই ব্যাবর্তক। নিজের ভেদের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে না। যদি বিশেষ নিজেই নিজের ভেদের জন্য অন্য কোনো বিশেষের উপর নির্ভর করে, তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে।

মহর্ষি কণাদ সমবায়কে অন্যতম পদার্থ বলে উল্লেখ করলে তিনি সমবায়ের সংজ্ঞা দেখান। পরবর্তী দার্শনিকগণ বলেন দুটি অযুথবিদ্ধ ও আধার সাধেয় পদার্থের সম্বন্ধ হল সমাজ সম্বন্ধ। একটি ঘট ও তার সামান্যে সাধ্য সম্বন্ধ হল সমবায়। সমবায় হল স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সমবায় পাঁচ রকম হতে পারে ঃ (১) ব্যক্তির সাথে জাতির, (২) অঙ্গ-অঙ্গী, (৩) নিত্যদ্রব্যের সঙ্গে বিশেষের, (৪) দ্রব্য ও গুণের ও (৫) দ্রব্য ও কর্মের সম্বন্ধ।

বৈশেষিকগণ বলেন টেবিলের দিকে তাকালে ফুলদানি থাকলে তার অস্তিত্ব যেমন প্রত্যক্ষ করি তেমনই ফুলদানির অভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে থাকি। তাই অভাব হল একটি পদার্থ। অভাব হল নঞর্থক পদার্থ। অভাব দু'প্রকার সংসর্গাভাব ও অনোন্যাভাব। সংসর্গাভাব বলতে বোঝায় কোনো কিছুতে কিছু নেই। অনোন্যাভাবে বলা হয় একবস্তু অপর বস্তু নয়। সংসর্গাভাগ তিন প্রকার ঃ (ক) প্রাগভাব—পূর্ববর্তী অভাবই প্রাগভাব, এর আদি নেই অন্ত আছে। (খ) ধ্বংসাভাব—উৎপন্ন হওয়ার পর কোন বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে তার যে অভাব তা-ই হল ধ্বংসাভাব। এ আদি কিন্তু অনন্ত। (গ) অত্যন্তাভাব একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর চিরকালীন অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। এ অনাদি অনন্ত। আর অনোন্যাভাব বলতে দুটি বস্তুর মধ্যে অভিন্নতার অভাব বোঝান হয়। তাঁরা মনে করেন প্রত্যক্ষের সাহায্যেই অভাবকে জানতে পারি।

বৈশেষিক দর্শনের জগতের সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা থাকলেও ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই দর্শনে মোক্ষ নিয়েও ব্যাপক আলোচনা নেই।

ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির মধ্যে ন্যায়দর্শন অন্যতম। ন্যায়দর্শনে যুক্তি ও জ্ঞানের যথার্থ সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়দর্শন বেদেরই একটি শাখা, তাই বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে এই দর্শন। যদিও বেদে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে নিয়ে তবেই সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে ন্যায়দর্শনে। সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে ন্যায়দর্শন গড়ে উঠেছে। চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বচ্ছতা ও যথার্থতাই এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য। ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করেন ঋষি গৌতম। পরবর্তীকালে বাৎস্যায়ন, উদয়ন, বাচস্পতি প্রমুখ ন্যায়বিদগণ এই দর্শনকে আরও উচ্চমার্গে নিয়ে যান। ন্যায়দর্শনকে তর্কশাস্ত্রও বলা হয়। জ্ঞানলাভের মাধ্যমে পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভই এই দর্শনের মূলকথা। কর্মে সফলতা ও বিফলতার উপরই নির্ভর করে জ্ঞানের সত্যতা ও অসত্যতা। সত্যের সঙ্গে জ্ঞানের যথার্থ

সংযোগ থাকলেই জ্ঞান সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এদিক থেকে প্রয়োগবাদী দর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের সাযুজ্য রয়েছে। ন্যায়দর্শনে অনুমানের একটা বিশেষ স্থান আছে। যেমন আকাশে মেঘ দেখলে আমরা বলি বৃষ্টি হবে। অর্থাৎ মেঘ দেখলেও আমরা বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিনা, তবু বলি মেঘ দেখে বৃষ্টি হবে। কারণ মেঘ থাকলেই বৃষ্টির সম্ভাবনা—এই দুটি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে অনুমান গঠিত হয়। অনুমানের উপর নির্ভর করে যে জ্ঞান গঠিত হয় সেই জ্ঞান সাধারণ থেকে বিশেষে এবং বিশেষ থেকে সাধারণ সত্যে পৌঁছানোর জন্য অবরোহণ ও আরোহণমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া শব্দ, উপমান ইত্যাদি প্রমাণের উপর ন্যায়দর্শন নির্ভর করে। সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতো ন্যায়দর্শনও বেদে বিশ্বাসী এবং বিশ্ববিধাতা এইভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে।

প্রতিটি দেশে ও যুগে শিক্ষাচেতনা সেই দেশ ও যুগের জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়। বৈদিক যুগের শিক্ষাচেতনাও তাই দার্শনিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বেদ শব্দের অর্থই জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হয়ে পরম পরিণতি লাভ সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন বৈদিক ঋষিগণ। অজ্ঞানতাই বন্ধন—জ্ঞানই মুক্তি পথের দিশারী—এই ছিল প্রাচীন ঋষিদের মত। তাঁরা শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন—অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উত্তরণ ('তমসো মা জ্যোতির্গময়'), বন্ধন থেকে মোক্ষলাভ। সেজন্য শুধু শুষ্ক জ্ঞান আহরণ নয়—অনুশীলন ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জ্ঞান রূপান্তরিত হবে শক্তিতে। সুতরাং মননের সাহায্যে নিজের ও পরমাত্মার শক্তিকে অধিকার করাই প্রকৃত শিক্ষা।

বৈদিক যুগে অধ্যাত্মজীবন ও সমাজজীবন গড়ে উঠেছিল যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে পরমশক্তির বিশেষ বিশেষ রূপ হিসাবে কল্পনা করে নিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানানোই ছিল যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য। সজ্ঞানে 'হোতা' কর্তৃক উচ্চারিত 'আহব'ই প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র, আর এই মন্ত্রের সংকলনই 'সংহিতা'। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞাদি ক্রিয়া জটিলতর হয় ; ঋত্বিকদের মধ্যে শ্রমবিভাজন হল—যে শ্রেণীর ঋত্বিক 'ঋক' অর্থাৎ পদ্যময় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন তাঁদের বলা হত 'হোতা'। ছন্দোবদ্ধ ঋকমন্ত্র সংকলনই ঋক্‌বেদ সংহিতা। সুতরাং 'হোতা'দের বিশেষীকরণ মন্ত্র হল 'ঋগ্‌বেদ'। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা হলেন 'উদ্‌গাতা'। যজ্ঞকালে অনুষ্ঠিত নীতি-পদ্ধতির সংকলনই হল 'যজুর্বেদ'। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের বলা হত 'অধ্বার্জু'। এই তিনের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য চতুর্থ একশ্রেণীর প্রয়োজন হল। এই চতুর্থ শ্রেণীকেই বলা হয় 'ব্রহ্মণ'। এঁদের কর্মপদ্ধতি বিধৃত হয়েছে 'ব্রাহ্মণ'-এ। আর যজ্ঞবিধিকে প্রাচীন ঋষিগণ যে পরম দার্শনিকতায় মহিমান্বিত করেছিলেন, তারই রূপ

'আরণ্যক'। নির্ভুল ছন্দ, অর্থ, ধ্বনি এবং অনুভূতি দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের উপর এবং যথা সময়ে, যথাবিহিত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতো যজ্ঞের সার্থকতা। সেজন্য বেদ চর্চার অনুষঙ্গরূপে সৃষ্টি হল ছয়টি বিশেষ শাস্ত্র—ষড় বেদাঙ্গ নামে যা পরিচিত। এগুলি হল শিক্ষা (ধ্বনিতত্ত্ব), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (ব্যুৎপত্তিগত), জ্যোতিষ এবং কল্প (বিধিতত্ত্ব)। এই ছয়টি শাস্ত্র প্রজ্ঞায় বিশেষীকরণের ক্ষেত্র। এরপর নির্ভুল যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য ভারতীয় জ্যামিতি, গণিত, সময় নির্ঘণ্ট প্রস্তুতির জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান, যজ্ঞফলের শুভাশুভ নির্ধারণের জন্য গণনা শাস্ত্র, নির্ভুল যজ্ঞবলির জন্য প্রাচীন শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান, নির্ভুল ভাষাচর্চার জন্য ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষীকরণ করা হয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় সাংখ্যদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

সাংখ্যদর্শনে জানা বা জ্ঞান সম্ভব হয় বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপনের ফলে। এই সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি প্রভাবিত হয়। পরবর্তী সময়ে মন ও বুদ্ধি জীবের মন ও বুদ্ধি তা 'বিশ্লেষণ' করে এবং শেষ পর্যায়ে তা বিষয়াকারে উপস্থাপন করে। বুদ্ধি আত্মার চেতন অংশে প্রতিফলন ঘটায় এবং এই প্রতিফলনের ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান লাভ করে।

যে ব্যক্তিগত বৈষম্য বা Individual difference আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের মূল উপজীব্য সেই ব্যক্তিগত বৈষম্য তত্ত্বের বীজ নিহিত আছে প্রাচীন ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনে। সেখানে আত্মার গুণগত পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে এবং তদনুসারে আত্মার বহুত্বতত্ত্ব সাংখ্যদর্শন প্রচার করেছে।

বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে অচেতন অথচ সক্রিয় প্রকৃতি যখন চেতন অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষের সংস্পর্শে আসে তখনই সৃষ্টি সম্ভব হয়। এই সৃষ্টির আগে প্রকৃতির গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে, পুরুষ যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, অর্থাৎ শক্তি ও জড়বস্তু যখন নিকটবর্তী হয় তখনই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় ও সৃষ্টি শুরু হয়। আধুনিক বিজ্ঞানও সেই একই কথা বলে (Posivive ও Negative বৈদ্যুতিক তার দুটিকে যখন সংযোজিত করা হয় তখনই আলো জ্বলে—আলোর সৃষ্টি হয়)—আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সাযুজ্য আমরা দেখতে পাই। আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়—আত্মসক্রিয়তা, সৃজনশীলতা ও নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষালাভ করে থাকে। শিক্ষা একটা গতিশীল প্রক্রিয়া। সাংখ্যদর্শনেও আমরা দেখি সেখানে বলা হয়েছে সবরকম কার্যের পিছনেই কারণের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কারণ ব্যতিরেকে কোনো কার্যই সম্ভব হয় না।

সৃষ্টি বা সৃজন প্রক্রিয়া সুপ্ত সম্ভাবনার প্রকাশমাত্র। সুতরাং ব্যক্তির প্রবণতা, ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি অনুসারে শিক্ষা পরিচালনার কাজ না করলে তা কখনোই সার্থক হয় না। সাংখ্যদর্শনের বিধান অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্বে প্রথম উৎপন্ন উপাদানটি হল বুদ্ধি বা মননশীল মানুষের সম্পদস্বরূপ।

বুদ্ধির অধিষ্ঠান মানুষের অন্তরে। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, প্রবণতার সার্থক সফলতা শিক্ষা পরিবেশের পরিচালনার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি এবং তার পরিবেশের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটে। যেহেতু সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপন হলেই জ্ঞান লাভ সম্ভব, তেমনি বাইরের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বস্তুর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। এইভাবে সরল থেকে জটিলে, মূর্ত থেকে বিমূর্তে জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং এরকম একইভাবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানেও জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেজন্যই শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জন, সঞ্চালন এগুলি অত্যন্ত আবশ্যিক। দেহমন যে পরস্পরের পরিপূরক, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের এই স্বীকৃত সত্যটি সাংখ্যদর্শনের বিবর্তন তত্ত্বেও প্রমাণিত। শিক্ষার পাঠ্যক্রম (আধুনিক) সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, রুচি ও মস্তিষ্কের এবং দেহের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গঠন করা বা রচনা করা উচিত বলে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন এবং শিক্ষায় সাংখ্যদর্শনের উপযোগিতাকে বা প্রাসঙ্গিকতাকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় 'যোগ' দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ বলেন—ব্যক্তির সুসংহত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। যোগদর্শনে যেমন বলা হয়েছে—সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে রোগ, দুঃখ, দোষের দূরীকরণ করাই যোগদর্শনের লক্ষ্য। যার ফলে মানবাত্মা পরাশান্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করে। যোগদর্শনের এই মূল বক্তব্যই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী তথা দার্শনিক জন্ লক-এর বক্তব্যের মধ্যে যিনি বলেছেন, 'সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার'। সেজন্য শিক্ষানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শারীরিক অনুশীলনের কথাও বলেছেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগদর্শনের প্রাসঙ্গিকতাকেও অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় ন্যায়দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

জ্ঞানতত্ত্বে জিজ্ঞাসাই মূল উৎস। বুদ্ধিগত অনুশীলন ব্যতিরেকে জিজ্ঞাসার সমাধান সম্ভব নয়। সেজন্য ন্যায়দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব বা Epistemology-র উপর গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে। অনুশীলনের দ্বারা মন তথা বুদ্ধিকে পরিশীলিত করাই ন্যায়দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এদিক থেকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন ন্যায়দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক শিক্ষা যেমন শুধু নীরস কিছু তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ ও সঞ্চয়নকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করে না, প্রাচীন ন্যায়-দর্শনেও তেমনি আমরা দেখতে পাই জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয়নকে (যা পূর্ব পরিকল্পিত) প্রকৃত জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয়নি। আধুনিক শিক্ষা দর্শনে আমরা দেখি ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ, মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে যে শিক্ষা শিক্ষার্থী লাভ করে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, তর্ক, বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে ন্যায়দর্শনেও প্রকৃত জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে অনুসৃত মস্তিষ্ক (Head), হৃদয় বা মন (Heart) এবং কর্ম প্রবণতা অথবা হাতের কাজ (Hand) এই 3'H' বা তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের পন্থা হিসাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ন্যায়দর্শনেও তার প্রতিফলন দেখা যায়—জ্ঞাত হওয়া, অনুভব করা ও সেই অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এগুলিকে ভিত্তি করেই যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব সে কথাই ন্যায়দর্শনেও বলা হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষা-পাঠ্যক্রম রচনাতেও ন্যায়দর্শনের রীতি-নীতি অনায়াসে অনুসরণ করা যায়। কারণ বর্তমানে পাঠ্যক্রম রচনায় যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ন্যায়দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। ন্যায়দর্শনের মতে কোনোকিছু জানতে হলে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বস্তু, পদার্থ সম্বন্ধে জানা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রমেও আমরা দেখছি, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানত্রয়ী (জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলির তাত্ত্বিক (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Practical) উভয়ই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতেও আমরা দেখি ন্যায়দর্শনের প্রতিফলন। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জটিল বিষয়কে সরল করে শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতাকে সাহায্য করা হয়, তার মন ও মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে তোলা হয়। ন্যায়দর্শনেও যুক্তি-তর্ক-আলোচনা-বাগ্-বিতণ্ডা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র 'জ্ঞানমূলক' নয় পারস্পরিক গুরু-শিষ্য সম্পর্কটিকেও সহজ-সরল-ঘনিষ্ঠ করে তোলা হত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যা একান্তভাবেই অনুসরণীয়।